শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু প্রদত্ত

অজপা সাধনতত্ত্ব

(স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী)

অজপা সাধনের অর্থ কি ?

“অজপা-সাধন” দুইটি শব্দের সমষ্টি। অজপা ও সাধন। যে পদ্ধতিতে সাধন করিলে অজপা জপ আপনা আপনি সম্পন্ন হয় তাহাই অজপা সাধন। অজপা শব্দের অর্থ (১) জপরহিতা, অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়া জপ করিতে হয় না, স্বতঃসিদ্ধ ভাবে শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ হইয়া থাকে।
(২) প্রাণবায়ু। (৩) স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের নির্গমন ও প্রবেশ ক্রিয়ার দ্বারা মন্ত্র জপ।

মন্ত্র গ্রহীতার বিনা জপেই জপ হয়। এ কারণে ইহাকে অজপা কহে। ইহা সংসার-পাশ-ছেদিকা। জীব এই পদ্ধতিতে প্রতিদিন একুশ হাজার ছয়শত বার নাম জপ করে। অজপা অবস্থা লাভ করিতে যে সাধন পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়, তাহাকেই অজপা সাধন কহে। সদগুরু প্রদত্ত শক্তিশালী মন্ত্র শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ করিতে করিতে তাহা শ্বাসের সহিত মিলিয়া যায় তখন আর ইচ্ছা করিয়া জপ করিতে হয় না। চলিতে ফিরিতে, খাইতে শুইতে, সর্ব্বদা শুচি অশুচি সকল অবস্থায় গুরুদত্ত শক্তিপূত নাম শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিলাইয়া ২৪ ঘণ্টা জপ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে যেন একটি শ্বাসও বাদ না যায়, মনে মনে জপ করিতে হয়। ঠোঁট কাঁপিবে না, জিহ্বা নড়িবে না, প্রত্যেকটি শ্বাসের প্রতি নজর করিয়া গুরুদত্ত প্রণালী অনুসারে গুরুদত্ত মন্ত্র শ্বাসে-প্রশ্বাসে অবিরাম জপ করিতে করিতে তাহা শ্বাসের সহিত মিলিয়া যাইবে ও শ্বাস নামময় হইবে। তখন অজপাজপ আপনা হইতেই চলিবে। চলিতে ফিরিতে, খাইতে বসিতে, ভ্রমণে নিদ্রায় সর্ব্বদা সর্ব্ব অবস্থায় তখন অবিরাম শ্বাসে শ্বাসে অজপাজপ চলিবে। এই অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে গুরুদত্ত পদ্ধতি অনুসারে গুরুদত্ত শক্তিপূত নামকে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত মিলাইয়া শ্বাস-প্রশ্বাসকে নামময় করিবার জন্য যে সাধন করিতে হয় তাহাকেই অজপা সাধন বলে।

ইহার প্রবর্তক কে ?

শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় স্বয়ং শ্রীভগবান নারায়ণ এই সাধনার প্রবর্তক। ব্রহ্মা, ভগবান সদাশিব, মহর্ষি নারদ, দত্তাত্রেয়, বশিষ্ঠ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি এই সাধনার দ্বারাই ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অসাধারণ শক্তিসমন্বিত এই নামসাধন মাত্র রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখি মাইতি ও

তাঁহার ভগিনী মাধবীদেবীকে দান করেন। গুরু নানক, কবীর, তুলসীদাস এই প্রণালী অবলম্বনেই সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থে অজপা সাধন সম্বন্ধে বহু উক্তি দেখা যায় ও এই সাধনের শ্রেষ্ঠতা তাঁহারা উচ্ছ্বসিতভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভু এই সাধন মানস সরোবরের পরমসংস ব্রহ্মানন্দ'র নিকট প্রাপ্ত হন ও জীব উদ্ধারের জন্য এই সাধন দান করেন। অজপাজপের প্রণালী বিভিন্ন প্রকার রহিয়াছে। শ্বাসে শ্বাসে মনে মনে নাম জপ ইহার সাধারণ প্রণালী। গুরু দীক্ষাদানকালে ইহা বিশেষভাবে দেখাইয়া দেন।

এই সাধন দানের অধিকারী কে ?

এই সাধন ইচ্ছা করলেই কেহ দিতে পারে না। অর্থাৎ এই সাধন দিবার মত শক্তি না লাভ করিলে এই সাধন দিয়া কাহারও কল্যাণ করা যায় না। সদগুরু(গোঁসাইজী) যাঁহাকে এই সাধন দিবার নির্দেশ দেন, তিনিই এই সাধন দানের অধিকারী। বাস্তবপক্ষে যিনিই এই সাধন দেন, তাঁহার মধ্যে সেই গুরুশক্তিই কার্য করে। যে আধারকে সদ্গুরু নিজের শক্তিপ্রকাশের উপযুক্ত মনে করেন সেই আধারেই শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া সদ্গুরু তাহার মারফৎ এই সাধন দান করেন। সদগুরু ভগবান- ভগবানই সদগুরু। যে মানুষে সেই গুরুশক্তির প্রকাশ হয় ও যিনি যে আধার হইতে এই শক্তি গ্রহণ করেন সেই আধারভূত মহাশক্তির প্রকাশ সমন্বিত যে দেহী, সেই দেহীই তাহার গুরু। বাস্তবপক্ষে সমস্ত গুরুশক্তিই এক- বিভিন্ন আধারে প্রকাশিত হইয়া তাঁহারা জীবের উদ্ধার করেন। সদ্‌গুরুই এই দীক্ষা দানের অধিকারী। ভগবদ্‌শক্তিই সদ্‌গুরুরূপে দেহীর মধ্যে রূপ লয়েন। যিনি যে আধার হইতে এই সাধন পাইবেন তাঁহার নিকট তিনিই সদ্‌গুরু।

এই সাধন পাইবার যোগ্য কে ?

এই সাধন পাইবার যোগ্য কে তাহা সদ্‌গুরুই পরীক্ষা করিয়া লয়েন। প্রার্থী হইলেই এই সাধন পায় না। আবার প্রার্থী না হইলেও সদগুরু খুঁজিয়া বাড়ি গিয়া সাধন দিয়া থাকেন। এই সাধন পাইবার কালাকাল নাই। সদ্গুরু যখনই সাধন দিবেন তখনই তাহার যোগ্যকাল। যাহাকে সাধন দিবেন তাহারই সাধন পাইবার সময় হইয়াছে জানিতে হইবে। কালাকাল, বয়স, জাতি, বর্ণ প্রভৃতির বিচার এখানে অচল। সদ্‌গুরুর কৃপাই এই সমস্যার সমাধান করে। গুরুশক্তির নির্দেশেই এই সাধন হইয়া থাকে।

গুরুদেহ

ভগবান বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন- স্ত্রীদেহ দীক্ষাদানের অধিকারী নহে। পুরুষ দেহ হইলে ব্রাহ্মণই সর্বশ্রেণীর লোককে দীক্ষা দিতে পারেন। ব্রাহ্মণেতর দেহ, ব্রাহ্মণ

ব্যতীত অপর দেহের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না। শাস্ত্র বলেন- সিদ্ধদেহ হইলে স্ত্রী পুরুষ বিচারের প্রয়োজন নাই। স্ত্রীদেহ সিদ্ধ হইলে তখন তাঁহার লিঙ্গজ্ঞান থাকে না। স্ত্রী ও পুরুষদেহ সিদ্ধ হইলে তাঁহারা ব্রহ্মে স্থিতি করেন বলিয়া লিঙ্গাজ্ঞানাতীত। কাজেই তাঁহারা পুরুষের কাছে পুরুষ, স্ত্রীর নিকট স্ত্রী বলিয়াই প্রতীত হয়েন। তাঁহাদের লিঙ্গজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হন না।

স্ত্রী গুরু

স্ত্রীদেহ গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া নিজ উপাসিত মন্ত্র দিতে পারেন- ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ। স্ত্রীগুরু নিজ গুরুর নিকট হইতে যে মন্ত্র পাইয়াছেন সে মন্ত্রই দিতে পারেন। এক্ষেত্রে শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীগুরুর গুরুই স্ত্রীগুরুর নিকট হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির গুরু বলিয়া বিবেচিত হয়েন। স্ত্রীগুরু নিজেকে গুরু বলিয়া বিবেচনা করেন না। স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষা লইতে হইলে একজন উপগুরু রাখিতে হয়। শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু প্রথম তাঁহার মাতার নিকটই দীক্ষা গ্রহণ করেন।

অজপা সাধন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত

বীজ উপ্ত হইলে যেমন অনুকূল আবহাওয়ায় অঙ্কুরিত ও ক্রমে বর্ধিত ও পল্লবিত হইয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। এই সাধনবীজ তেমনি জীবনক্ষেত্রে পতিত হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত মিলিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাসকে নামে লয় করিয়া নামময় ভগবতী তনুর সৃষ্টি করিবে।
সংসারে থাকিয়া সংসারের সকল কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সঙ্গে শ্বাসে প্রশ্বাসে এই নাম জপ করিলে দেহের শিরা উপশিরা, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অন্ত্র ও রক্তকণিকার মধ্য দিয়া এই শক্তিপূত নাম সমস্ত দেহের মধ্যে ব্যাপ্ত হইবে। শ্বাস-প্রশ্বাস দেহের রক্তকে শোধন করে। শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত বাহিত হইয়া এই নাম দেহের সমস্ত অন্ত্র ঘুরিয়া রক্ত শোধনের সহিত তাহার অমিত শক্তির স্পর্শ দিয়া সমস্ত দূষিত পদার্থের সহিত মনের ও ইন্দ্রিয়প্রভাবজনিত সঞ্চিত ময়লা সমস্ত ধীরে ধীরে বাহির করিয়া দিয়া সবল সুস্থ দেহকে নামের শক্তিতে ভরপুর করিয়া শ্বাসে শ্বাসে গৃহীত নামের প্রভাবে প্রভাবিত দেহকে ক্রমে নামময় করিয়া তুলিবে। তখন মনের মধ্যে নাম, দেহের শিরা উপশিরায় নাম, রক্তকণিকায় নাম এবং দেহের বহিরঙ্গে ও ত্বকের উপর নাম ফুটিয়া উঠিবে। শিরাগুলি ত্বকের নিম্নে নামের প্রভাবে নামরূপ ধারণ করিবে। হস্তে, পদে, বক্ষে, বহ্নশিরায় ওঁকারাকৃতি প্রণব মন্ত্র ফুটিয়া উঠিবে, বিলয় পাইবে, আবার ফুটিয়া উঠিবে।

অজপা সাধনের প্রণালী

অজপা সাধনের প্রণালী গুরুর নিকট ছাড়া জানিবার উপায় নাই। শ্রীগুরু দীক্ষার সময় এই নাম সাধনের প্রণালী বলিয়া দেন, বিধি-নিষেধ বলিয়ে দেন ও শিষ্যের ক্রমোন্নতি অনুসারে তাহাকে সময়মত উপদেশ দিয়া তাহাকে অগ্রসর করেন।

এই নির্দেশ সদগুরু প্রত্যক্ষভাবেও দিতে পারেন, সূক্ষ্মশরীরে গিয়াও দিতে পারেন-যখন যেভাবে প্রয়োজন, প্রয়োজনমত সদগুরু শিষ্যকে পরিচালিত করেন। গুরু দেহরক্ষা করিলেও শিষ্যের নিকট গুরুশক্তি প্রয়োজন হইলে সেইরূপ ধারণ করিয়াই উপযুক্ত উপদেশ, আদেশ ও নির্দেশ দিয়া থাকেন।

গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ

গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর সম্বন্ধ, ইহা ব্যবসায় নহে। গুরু শিষ্যকে সর্বার্থসাধক মহাসম্পদ দান করিবেন। গুরু-শিষ্যের মধ্যে কোন বৈষয়িক বা আর্থিক সম্বন্ধ থাকিবে না। শিষ্য আবার গুরুকে দান করিবে কি ? গুরুই শিষ্যের প্রয়োজনমত পরমার্থের পথে শক্তি দান করিয়া চলিবেন। শিষ্য কোন কামনা করিয়া গুরুকে কোন দান করিবে না। গুরু কখনও শিষ্যের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিবেন না। সদ্‌গুরু বৈষয়িক সকল সম্বন্ধের অতীত। তিনি শিষ্যকে জড়জগতের সকল মোহ, বাসনা, কামনা, ভোগ, সুখ, মান, সম্মান, যশ হইতে ক্রমে মোহমুক্ত করিয়া পরমার্থপ্রাপ্তির পথে লইয়া যান। সদ্‌গুরু শিষ্যের মধ্যে স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন তাঁহার পূজা করেন। শিষ্যের সমস্ত দুর্ভোগ ও পাপের বোঝা গুরুকে বহন করিতে হয়। গুরু প্রতিদিন প্রতিটি শিষ্যের কথা চিন্তা করেন ও অলক্ষ্যে থাকিয়া ভোগের মধ্যে শিষ্যকে ভোগাইয়া পোড়াইয়া পোড়াইয়া খাঁটী করিয়া ক্রমে নিজের স্বরূপে তাহাকে টানিয়া লয়েন। শিষ্য ভুগিয়া ভুগিয়া কাঁদে, গুরু ততোধিক ব্যথা সহেন। তবুও তাঁহার প্রিয় সন্তানকে খাঁটি করিয়া লইবার জন্য সেই ব্যথা হাসিমুখে সহিয়া ক্রমে মোহমুক্ত শিষ্যের মুখে নিত্য আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলেন।

অজপাজপ ও প্রাণায়াম

যদিও এই সাধনের সহিত প্রাণায়াম শিক্ষা দেওয়া হয় পরন্তু যদি কেহ প্রাণায়াম নাও করেন, গুরু নির্দিষ্ট প্রণালীতে শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপ করিয়া যান তবে আপনা হইতেই প্রাণায়ামের ক্রিয়া হইবে। আসনে স্থিরভাবে বসিয়া শ্বাসে-প্রশ্বাসে এই নাম করিতে করিতে ক্রমে শ্বাস হ্রস্ব হইয়া আসিবে ও আপনা আপনি কুম্ভক হইয়া যাইবে। শুধু নামজপ দ্বারাই সমাধিলাভ অজপা সাধনে সম্ভব। শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন- “নামে রুচি জন্মিলে আর কিছু না করলেও হয়। শুধু নাম নিয়ে পড়ে থাকলেই হয়। কেবল ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে নাম করলেই সহজেই প্রবৃত্তি দমন হয়। বাহ্যিক উপায় কিছু নয়। নাম করতে করতে আপনিই সমস্ত চলে যাবে। প্রকৃত সাধন শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করা। তাহা অভ্যাস হলে প্রাণায়ামও স্বাভাবিক হয়ে যায়। বীর্যও স্থির হয়। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করতে পারলে আর কিছুরই দরকার নাই। উহাতে প্রাণায়াম কুম্ভকাদি সমস্তই হয়ে যাবে।“

একমাসে সিদ্ধি

শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু একমাসে সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে বলিয়াছেন- “একমাসকাল কেহ ব্যাবস্থানুরূপ নিয়মে থাকিয়া নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন করিলে তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবেন। শীঘ্র দেহত্যাগ হইবে- যদি কাহারও প্রাণে এইরূপ আশংকা হয়, সিদ্ধিলাভের পূর্বেই দেহত্যাগ হইতে পারে বলিয়া যদি কাহারও অন্তরে আক্ষেপ আসে অনায়াসে তিনি ইচ্ছা করলে একমাসকাল নিয়মে থাকিয়া এই প্রণালী ধরিয়া সাধন করিতে পারেন, সিদ্ধিলাভ করিবেন।“

নিয়মগুলি এইঃ-

১। লোক সঙ্গ ত্যাগ। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের দর্শন, স্পর্শন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ ও চিন্তনাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়।

২। নির্জনে শুচিশুদ্ধভাবে দিবসে একবার মাত্র স্বপাক আতপান্ন আহার।

৩। শয়ন ত্যাগ। অত্যন্ত অবসাদ বোধ করিলে বাহুমাত্র উপাধানে ভূমিশয়ন।

বাহিরে এই সকল নিয়ম পালনের সঙ্গে নির্দিষ্ট প্রকারে মুদ্রাবন্ধন এবং অহর্নিশি সিদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক প্রাণায়াম, কুম্ভক সংযোগে প্রণালীমত নামসাধন করিতে হইবে। এই প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিয়া একমাসকাল কেহ সাধন করিলে নিশ্চয়ই তিনি সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবেন। অন্ততঃ তিনটি দিনও যদি কেহ করেন, তিনি সাধারণের দুর্লভ কোনও একটি বিশেষ অবস্থা লাভ করিবেন, ইহাতে আর কোনও সংশয় নাই।

অজপা সাধনের লক্ষ্য

এই সাধনের লক্ষ্য কোনও অর্থ, সম্পদ বা ইহজগতের ভোগ সুখ নহে। ইহার লক্ষ্য হইল ভগবৎ প্রাপ্তি, যাঁহাকে পাইলে সবই পাওয়া যায় সব ছাড়িয়া তাঁহাকেই পাওয়া। তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে পাইলে সব আপনি আসিবে। তাঁহাকে বাদ দিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা অনিত্য। কিন্তু সেই নিত্যবস্তুকে পাইলে সর্বপ্রাপ্তির আনন্দ- নিত্যানন্দ লাভ করা যায়।

নাম ও নামী

নাম জপ করিতে করিতে নামী সাধকের নিকট স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন। নাম দুটি অক্ষর নহে বা একটি শব্দ নহে। নাম ও নামী অভেদ। নাম করিতে করিতে নামের সঙ্গে সঙ্গে নামী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ান। ভক্ত তখন নাম ভুলিয়া নামীকে দেখিয়া তাঁহার মধ্যে নিজ চেতনা হারাইয়া ফেলেন, সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। নামীর মধ্যে ভক্ত ডুবিয়া গেলেও নাম সমস্ত দেহে আপনা আপনিই চলে, শ্বাস-প্রশ্বাস নামময় হইয়া গেলে নাম ও নামী অভেদ হইয়া ভক্তের অন্তর বাহ্য পূর্ণ করিয়া ভক্তকে নিজ সত্ত্বায় ডুবাইয়া লন। ভগবান বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন- “এই সাধনপথে চললে ভগবানের অনন্ত বিভূতি, যাবতীয় লীলা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হতে থাকবে। নৌকায় চলার মত দুপাশে কতই দর্শন করবে। শুদ্ধাভক্তির সহিত সর্বত্রই প্রণাম করবে। আসক্ত কোথাও হবে না। আসক্ত হলেই সেখানে বদ্ধ হয়ে পড়বে। অগ্রসর না হলে নূতন দর্শন হয় না, নূতন কোন অবস্থা লাভ হয় না।“

নাম করিতে করিতে সাধক এই সমস্ত লীলা ও বিভূতি দর্শন করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেই পরমপুরুষ নামীর পরিপূর্ণ রূপ দেখিয়া কৃতার্থ হইবেন।

উপাস্য

উপাস্য শ্রীভগবান- পরম ব্রহ্ম।
"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবং অদ্বৈতং অপাপবিদ্ধং।"

- **ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ; আনন্দরূপে, শান্তিরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশমান। তিনিই মঙ্গল, একমাত্র, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।**

"ব্রহ্ম হইতে জন্মে জীব ব্রহ্মেতে জীবয়
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়।"

ভগবান সচ্চিদানন্দ অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী, নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ ; তবে তাঁহার মূর্তি গড়িয়া পূজা করে কেন ? মূর্তি দেবতা নহে। ঐ মূর্তিতে যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় তখনই তাহার পূজা হয়। মূর্তির পূজা নহে- প্রাণের পূজা। প্রাণ নিরাকার। বৈষ্ণবেরা যে রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন তাহাও মূর্তির পূজা নহে। ঈশ্বর পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রকৃতি দুইই। রাধাকৃষ্ণ পুরুষ ও প্রকৃতি। পরমাপ্রকৃতি রাধা। রাধাকৃষ্ণের উপাসনা পুরুষ ও প্রকৃতির সম্মিলিত উপাসনা- ব্রহ্মোপাসনা। উপাস্য দেবতা একই - যে যে নামেই পূজা করুন, যে রূপেই পূজা করুন সেই একেরই পূজা করা হয়। সর্বরূপই তাঁর রূপ। তিনি এক, অদ্বিতীয়, সত্যং শিবং সুন্দরং। সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ যোগীজনের হৃদয়রঞ্জন সেই অপূর্বরূপ রূপে রূপে রূপায়মান। সর্বত্রই প্রণাম কর, পূজা কর, এই ভাবিয়া যে ইহারই মধ্যে আমার ইষ্ট, আমার ভগবান পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তুমি প্রতিমার সামনে বসিয়া কাহার পূজা কর ? প্রতিমার মধ্যে যিনি ইষ্টরূপে, ভগবানরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন অথবা যাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাঁহাকে ? যদি ঐ মূর্তিরই পূজা করিতে তবে কুম্ভকারের ঘরেই তো তাঁহার পূজা করা চলিত। তবে তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কেন ? ইষ্টদেবতাকে প্রতিমা মধ্যে আহ্বান কেন ? উপাস্য তোমার সেই পরমব্রহ্ম। স্বাবলম্বন উপাসনা দ্বারা ক্রমে নিরালম্বন উপাসনায় যাওয়া যায়। অনুষ্ঠান সহকারে পূজা করিতে করিতে যত ভিতরে ডুবিবে তত বাহিরের অনুষ্ঠান কমিয়া যাইবে। পূজার ফুল হয়ত হাতেই থাকিয়া যাইবে, আরতির ঘণ্টা হাতে নড়িবে না। পূজা করিতে বসিয়া বা আরতি করিতে বসিয়া সেই পরম পুরুষের সহিত তোমার অন্তঃপ্রকৃতি যুক্ত হইয়া তন্ময় হইয়া যাইবে। তোমার প্রিয়তম, তোমার ইষ্ট, তোমার ভগবানের সঙ্গে তুমি যুক্ত হইবে। যে কোন দেবদেবীর মূর্তির সামনে বসিয়াই পূজা কর, তাহা যেরূপেই হউক, তুমি তাঁহার ভিতর তোমার ইষ্টকেই পূজা করিবে। ক্রমে এই দৃষ্টি তোমার সর্বত্র- ঘাসে,

পাথরে, পত্রে, পুষ্পে, প্রতি ধূলিকণার মাঝে তোমার প্রেমাষ্পদ, তোমার ইষ্ট, তোমার ভগবানকে দেখিবে। তখন দেখিবে সকলই ব্রহ্ম। ব্রহ্মময় জগৎ। কোন ভেদ নাই।

এই দীক্ষা ব্রহ্ম দীক্ষা

পরম ব্রহ্মের উপাসনাই এই সাধনের পন্থা ও পরম ব্রহ্ম প্রাপ্তিই এই সাধনের লক্ষ্য। প্রণব সংযুক্ত নাম প্রাপ্তি মাত্রেই সাধকের শরীরে শক্তির সঞ্চার হয়। ক্ষেত্রানুসারে ধীরে বা ত্বরিতে তাহার ক্রিয়া হয়। আগুন জ্বলিবেই- এই নামের আগুন সকল পাপ তাপ গ্লানি পুড়াইয়া, ছাই করিয়া, নির্মল করিয়া সাধককে ব্রহ্মে নীত করিবেই।

বিধি নিষেধ

সাধনার পথে চলিতে তাহার নিয়ম পালন করিতে হইবে। যে পথে যাইবে, গুরু সেই পথে কিভাবে যাইতে হইবে, পথে কিরূপ খাদ্যগ্রহণ করিলে অসুস্থ হইয়া পড়িবে না- সুস্থ শরীরে স্বীয় লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবে সতর্কতার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা বলিয়া দেন। ভবরোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সাধনপথে প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়া ঐ ঔষধের অনুপান বলিয়া দেন- পথ্য বলিয়া দেন। তাহা না হইলে শীঘ্র নিরাময় হইবে না। যে নিয়মগুলি যত সুন্দরভাবে পালন করিতে পারিবে, নাম ততই তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিবে। আরশির উপর ময়লা পড়িয়াছে। সাফ করিবার পন্থা গুরু দেখাইয়া দিয়াছেন। যে যত শীঘ্র সাফ করিতে পারিবে, সে তত শীঘ্র উক্ত আরশিতে আত্মদর্শন করিতে পারিবে। গুরু পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, পাথেয় দিয়াছেন, রাস্তায় বিপদ-আপদের সম্ভাবনার কথা বলিয়া তাহা হইতে আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া দিয়াছেন ও সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে উপদেশ দিয়া পরিচালনের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। তাঁহার কথা শুনিলে, তাঁহার নির্দেশমত চলিলে, সত্বর লক্ষ্যে উপনীত হইবে, না চলিলেও তিনি ত্যাগ করিবেন না। তুমি যেখানেই যাও সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। তুমি এক এক ধাক্কা খাইবে- তখন তোমার চেতনা হইবে। আবার হয়তো ভুল করিবে, আবার ধাক্কা খাইবে। তোমার সাথে সাথে তোমার সকল দুর্ভোগের মধ্যেও তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এইরূপে সকল ভোগ শেষ হইলে তখন বলিবে "আমার সব প্রচেষ্টা শেষ হইয়াছে, এখন আত্মসমর্পণ করিলাম", গুরু তখন তোমাকে বুকে করিয়া তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন।

আত্মসমর্পণই বড় কথা

আত্মসমর্পন হইলে তো সবই হইয়া গেল। কিন্তু আমরা পারি না- মায়া, মোহ, ইন্দ্রিয় তাহাদের প্রভাবে আমাদিগকে তাহাদের মধ্যে ধরিয়া রাখে। যত নাম করিবে তত তাহাদের বন্ধন ছিঁড়িবে; প্রভাব কমিবে। যত তাহাদের প্রভাব হ্রাস পাইবে তত তাহারা আরো জোরে তোমাকে আক্রমণ করিবে। তোমাকে নাকের

জলে চোখের জলে কাঁদাইবে আবার তাহারই মধ্যে সুখকর প্রলোভন দেখাইবে, তোমাকে তোমার সাধন হইতে বিচ্যুত করিয়া মোহকরী কত প্রলোভনে ভুলাইতে আপ্রাণ প্রয়াস করিবে। তখনও নামকে ছাড়িও না। এক নামকে ধরিয়া থাকিলে শ্বাসে শ্বাসে নাম করিলে তুমি ইন্দ্রিয়প্রভাব মুক্ত হইবে। তোমার প্রতি রক্তকণিকা হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রভাব নিঃশেষে লুপ্ত হইবে। তোমার দেহ-মন-চিত্ত পবিত্র হইবে। ইন্দ্রিয়প্রভাব মুক্ত হইয়া শুদ্ধ বুদ্ধ ও ভগবতী তনু লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। গুরুচরণে মন রাখিয়া অনন্য শরন হইয়া নাম কর। নামই তোমার সকল অবস্থায় রক্ষক, পালক ও নামই তোমার সর্বফলপ্রদাতা, তোমার ইষ্ট, তোমার ভগবান।

নাম নামী নামদাতা

নাম করিতে করিতে নামের সঙ্গে নামী আসিবেন। কিন্তু তাঁহার রূপ কি ? "নাম নামী নামদাতা" অভেদ। প্রথমে নাম করিতে করিতে সাধকের সামনে নামদাতার রূপই ফুটিয়া উঠিবে। পরে নানা লীলা, নানান্ দৃশ্য, নানান্ দেবদেবীর মূর্তি সাধকের সংস্কার অনুযায়ী দৃষ্ট হইবে। পরে দেখা যাইবে শ্রীগুরুরূপ তাহাদের মধ্যে মিলিয়া যাইতেছে, আবার তাহারাও শ্রীগুরুরূপে মিলিয়া যাইতেছে। এইভাবে ক্রমে সকল রূপের অবসান হইয়া জ্যোতির্ময় ইষ্টরূপ দর্শন হইবে। তখনও দেখা যাইবে সে রূপ শ্রীগুরুমূর্তিতে মিলিয়া যাইতেছে আবার শ্রীগুরু সেই মূর্তিতে মিলাইয়া যাইতেছে। নাম, রূপ, আকার বা শব্দ তখন কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইবে ; মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিন্তা সব কোথায় বিলয় হইবে। তুমি সেই শ্রীগুরুরূপ ও ইষ্টদেবের অভেদত্ব দেখিয়া সেই রূপের অতল তলে ডুবিয়া যাইবে- দেখিবে নাম, নামী ও নামদাতা অভেদ।

সাধকের প্রথম অবস্থা ও তাহার অতিক্রম

সাধন করিতে বসিলে প্রথম প্রথম সাধনপ্রাপ্ত ব্যক্তির উৎসাহ দেখা যায়। পূজার ঘর, আসনের ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান আয়োজনের অন্ত নাই। আসনে বসিয়া নাম করিতে আরম্ভ করিলেই কিছুক্ষণ পরে চোখ জড়াইয়া আসে। ঠাকুরঘরে দেহ বন্দি থাকিলেও মন কতস্থানে চলিয়া যায়। পূজার আসনে বসিয়া যাবতীয় চিন্তার ভারে মন ভরিয়া যায়। তখন দেহ ও মনের জড়ত্ব দূর করিবার জন্য প্রাণায়াম করিতে হইবে। কিছুক্ষণ নাম ও কিছুক্ষণ প্রাণায়াম। মনকে বন্দি করিবার জন্য ভ্রুমধ্যে অন্তর্দৃষ্টি রাখিয়া বা নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া অথবা মূলাধারে দৃষ্টি রাখিয়া সাধন করিলে ফল পাওয়া যায়। মনকে বশ করা অতীব শক্ত। নিষ্ঠার সহিত শ্রীগুরুচরণে শরণ লইয়া নিজের কোনই শক্তি নাই- এইকথা আকুলভাবে নিবেদন করিয়া গুরুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নাম করিয়া যাইতে হইবে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে শ্বাস ও প্রশ্বাসের প্রতি মন নিবদ্ধ করিলে ধীরে ধীরে বহির্মুখী মন আয়ত্ত হইবে। মনকে বাহিরের বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তরে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। প্রতিটি শ্বাসে নামই তাহার উপায়। নামের শক্তিই মনকে বশীভূত করিবে। তোমাকে প্রাণপণে নামই করিয়া যাইতে হইবে। এই নামসাধনরূপ যোগ

শুরু হইলে ক্রমেই শ্রীগুরু তোমার মধ্যে সাধনপথে অগ্রসরের কৌশলগুলি দেখাইয়া দিবেন। তোমার অন্তরদেশে অধিষ্ঠিত সদ্‌গুরুরূপী ভগবান ধীরে ধীরে তোমার সামনে এক একটি শক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিবেন। তুমি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিবে। তোমার মোহে আবদ্ধ হইলে চলিবে না। তোমাকে সকল মোহ, সকল প্রলোভন, সকল ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়া, সকল পাশ ও সকল কোষ ভেদ করিয়া লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে। নাম-সাধনই তাহার প্রকৃষ্ট পন্থা।

অতি অল্প বয়স্ক শিশুও এই সাধনের অধিকারী কেন ?

বহু অল্পবয়স্ক শিশুকেও এই সাধন দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে এক বা দুই বৎসরের শিশুও সাধন পাইয়াছে। দেখা গিয়াছে প্রয়োজন ক্ষেত্রে পূর্ণগর্ভা রমণীও এই সাধন পাইয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে- এই অতি অল্প বয়স্ক শিশুরা যে সাধন পায় তাহারা তো কোন নিয়ম পালনই হয়ত করিতে পারিবে না ; তাহা জানিয়াও সাধন দেওয়া হয় কেন ? ইহা অতি নির্বুদ্ধিতার প্রশ্ন। একটি এক বৎসরের শিশু - ইহাই তাহার জীবন নহে। তাহার এক বৎসরের বর্তমান জীবনের পশ্চাতে তাহার পূর্বজন্ম রহিয়াছে। পূর্বজন্মের সহস্র সংস্কারাদি লইয়া সে আসিয়াছে। সে যদি একবৎসর পূর্বে না দেহত্যাগ করিত, তাহা হইলে হয়ত তাহার মৃত্যুর সময় যে বয়স হইয়াছিল পর নূতন দেহলাভের এক বৎসর পরে যে সময়, সেইসময় যোগ করিলে যে বয়স হইত সেই বয়সে এই দীক্ষা লাভ করিত। যেমন কেহ ৯০ বৎসরেও দীক্ষা পায়। কাজেই বৎসর হিসাবে বয়সই দীক্ষালাভের কালাকালের মাপকাঠি নহে। যখন যাহার সময় হইবে, সে দীক্ষা লাভ করিবে। নিয়ম পালন না করিলে ভুগিবে ও এই ভোগের দ্বারা তাহার কর্ম শেষ ও ভোগ শেষ হইবে। এমনও হইতে পারে অল্পকাল ভুগিয়া মহা দুর্ভোগের মধ্যে তাহার একটা জীবনের ভোগ নামপ্রভাবে কাটিয়া যাইবে। দীক্ষা লাভের কালাকাল বয়সের অনুপাতে নির্ধারিত হয় না। দেখা গিয়াছে নবম মাস গর্ভবতী রমণীও দীক্ষালাভ করিয়াছে। তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে কর ধরিয়া এবং ৩/৪ মাসকাল মুদ্রিতচক্ষু ও ধৃতকরাঙ্গুলী অবস্থায় বাঁচিয়া, গুরুস্পর্শে প্রথম চক্ষু মেলিয়া সঙ্গে সঙ্গে নাভিশ্বাস হইয়াছে ও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছে। ইহা গর্ভে থাকাকালীন সাধন প্রাপ্তির সুন্দর ফল। উক্ত গর্ভস্থ শিশুর পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতিফলে সমস্ত ভোগের শেষ হইয়া যতটুকু অবশেষ ছিল তাহা এই অতি অল্পকালে ধ্যানাবস্থাতেই কাটিয়া গেল। উক্ত শিশু কাঁদিত না। খাওয়াইয়া দিতে হইত, খাইবার সময় বা মলত্যাগের সময়ও ক্রন্দন করিত না। এখন ঐ যে নবম মাস গর্ভের মধ্যে অবস্থিত শিশু দীক্ষা পাইল ইহার কারন কি ?

অতি অনাচারী ও দূর্বৃত্ত জানিয়াও সাধন দেওয়া হয় কেন ?

অনেকে প্রশ্ন করেন যে অতি অনাচারী ও দূর্বৃত্ত জানিয়াও সাধন দেওয়া হয় কেন ? প্রথম, কেহ প্রার্থী না হইলে সাধন দেওয়া হয় না। একজন অতি দুরাচারী ও দূর্বৃত্ত যখন আসিয়া সাধন প্রার্থী হইল তখনই বুঝিতে হইবে যে সে তাহার

কৃতকর্মের ফল বুঝিয়া সৎপথে চলিতে প্রস্তুত হইয়াছে ও তাহার জীবনে শুভদিনের সূচনা হইয়াছে নতুবা সে আসিবে কেন ? হয়ত তাহার অতীত সংস্কার বশতঃ একদিনে তাহার অপকর্মের, অনাচারের ও দুষ্কার্যের স্রোত বন্ধ হইবে না, তবে যখন শুভবুদ্ধির উদয় হইয়াছে তখন ধীরে ধীরে তাহা নষ্ট হইবেই। সদ্গুরুর চরণে যখন সে আসিয়াছে ও আত্মসমর্পণ করিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে তাহার অগ্রগতি অতি শক্তিসম্পন্ন হইবে। কারণ দুষ্কৃতকারীরা যখন বুঝিতে পারে যে তাহারা একদিন ভুল করিয়াছে তখনই তাহারা গুরুর চরণে আসিয়া আত্মদান করে। শ্রীগুরুর কৃপায় তাহাদের সংস্কারগুলি ক্রমে কাটিয়া যাইবে। দেখা গিয়াছে অতি দুষ্কৃতকারীও এই সাধনবলে মহাসাধকে পরিণত হইয়াছে। আরও একটি কথা, অনেক ক্ষেত্রে সদ্গুরু যাচিয়াও দুষ্কৃতকারীকে সাধন দিয়া থাকেন। এরূপ সুযোগ যাহার জীবনে হয় বুঝিতে হইবে তাহার পূর্ব পর্ব জন্মের তপস্যা ছিল- কোনও কারণে তাহার অধঃপতন হইয়াছিল সেই ভোগ শেষ হইবামাত্র সদ্গুরু তাহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জগাই মাধাই উদ্ধার ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

সাধন লাভ করিয়াও অনাচারী হয় কেন ?

যখন জীবনে শুভদিনের সূচনা হয় তখনই জীব সদ্গুরুর আশ্রয় পায়। সদ্গুরুর আশ্রয় পাইয়াও অনেকে অনাচার করে। পূর্ব সংস্কার ছাড়িতে না পারিয়া অনেকে অনেক সাধন বিরোধী কাজও করে। সংস্কারমুক্তি ছাড়া মুক্তি নাই। সংস্কার অনুসারে মানুষ কাজ করে। সাধন প্রাপ্তির পরই একদিনে সমস্ত সংস্কার কাটিয়া যায় না। তাহার পূর্ব সংস্কার ও ভোগলিপ্সাদি তখনও থাকিয়া যায়। সাধন প্রাপ্তির পর যত নামের ক্রিয়া হয় তত তাহাদের প্রতাপ নষ্ট হয়। সাধন প্রাপ্তির পর যাহারা অনাচার করে তাহাদের দুর্ভোগ বাড়ে, শরীর অসুস্থ হয়, দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাহারা আক্রান্ত হয়, এই সমস্ত দুর্ভোগের মধ্য দিয়া তাহাদের ভোগ কাটিয়া যায়। সাধন পাইবার পর অনাচার করিলে দেহ অসুস্থ হইবেই ; এইভাবে দুর্ভোগের মধ্য দিয়া তাহার ভোগ কাটিয়া যাইবে। অনাচার পূর্ব সংস্কার বশতঃ করিয়া থাকে। নামের প্রভাবে ক্ষেত্রানুসারে ধীরে বা ত্বরিতে তাহা লুপ্ত হয়। দেখা গিয়াছে সাধন প্রাপ্তির পর নিয়মিত সাধকের সাধন লাভের পূর্বে যে সমস্ত বিষয়ে অতিরিক্ত ভোগস্পৃহা বা লোভ ছিল তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহা নামেরই ক্রিয়া। অনাচার করিলেও কতদিন করিবে ? নাম তাহাকে পোড়াইয়া পোড়াইয়া খাঁটি করিয়া লইবেই।

সাধন প্রাপ্তদের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া ছোট বড় বিচার

সাধনপ্রাপ্তদের বাহ্যিক আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াদি দেখিয়া সাধক জীবনের স্তরভেদ করা যায় না। এই সাধন বহির্সাধন নহে। অন্তর জগতে ইহার ক্রিয়া। এই সাধনপথে কে কত অগ্রসর হইতেছে তাহা নিজে বুঝিতে পারে না। বলা বাহুল্য কেহই পিছাইয়া যাইতেছে না। সকলেই অগ্রসর হইতেছে।

পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া যাইতে চড়াই ও উৎরাই আছে। উর্দ্ধতর শৃঙ্গে উঠিতে এক শৃঙ্গ হইতে নামিয়া তবে অন্য শৃঙ্গে উঠিতে হয়, এ ক্ষেত্রে কাহারও উৎরাই যাত্রা দেখিয়া ইহা বলা চলে না যে সে অগ্রসর হইতেছে না। সাধক জীবনে চড়াই ও উৎরাই রহিয়াছে। কেহ যেন না মনে করেন যে আমি অগ্রসর হইতেছি না। সাধনপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যদি যান ভালই, স্বেচ্ছায় যদি না যান তবুও গুরু তাহাকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া যাইবেনই। গোঁসাইজী বলিয়াছেন- রাখাল যেমন সকল গুরুগুলি নদী পার হইলে শেষ গরুটির লেজ ধরিয়া নিজে নদী পার হয় তেমনি সকল শিষ্যের মুক্তি পর্যন্ত গুরুকে শেষ শিষ্যের পিছনে ছুটিতে হয়। প্রত্যেকেই আপন আপন শক্তি অনুসারে চলিয়াছেন। আধার অনুসারে শক্তির প্রকাশ হয়। সদ্‌গুরুর কাছে সবাই সমান, তাঁহার কাছে ছোট বড় নাই। সকল সন্তানই তাঁহার প্রিয়। সাধনপ্রাপ্তরা আপন আপন শক্তি অনুসারে চলিয়াছেন- পরন্তু সকলেই অগ্রসর হইতেছেন, কেহই পিছু হটিতেছেন না। নিরলসভাবে যাহারা ছুটিবে তাহারা শীঘ্র পৌঁছিবে, আর যাহারা পথে আরাম চাহিবে, আয়াস চাহিবে, ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইবে তাহারা আটকাইয়া যাইবে পরন্তু পেছনে হটিবে না। আবার সে মোহ কাটিলে সে অগ্রসর হইবে। একদিন সকলেই সেই পরমানন্দ সায়রে নিমজ্জিত হইবে।

সদ্‌গুরু ও কুলগুরু

কুলগুরু অর্থে যিনি কুলকুন্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করেন তিনিই কুলগুরু। আমরা এখন পৈতৃক গুরুকেই কুলগুরু বলিয়া থাকি। কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ হিন্দু সমাজের একটি রীতি। ইহাতে কোনও দোষ নাই। কিন্তু কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইলেও সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লওয়া চলে ও যদি সাধন জগতে অগ্রসর হইতে হয় তবে সদ্‌গুরুর দীক্ষা তাহাকে লইতেই হইবে। বর্তমানে গুরুগিরি ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। ইহা দ্বারা হিন্দু সমাজের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে। কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া সেই গুরুকেই ভগবানরূপে যিনি পূজা করিতে পারেন, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন তাহাতেই তাঁহার কাজ হইবে। তখন সেই কুলগুরুই সদ্‌গুরুরূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়েন, অথবা তাঁহার মনের অবস্থাই তাঁহাকে উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া সদ্‌গুরুর কৃপাদানে কৃতার্থ করিয়া থাকে। গুরুনিষ্ঠা থাকিলে আর ভাবনা কি? কিন্তু বর্তমানে কুলগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ একটা সামাজিক নিয়মের মত হইয়াছে। গুরু যাহাই হউন বা যাহাই করুন সেদিকে দৃষ্টি না রাখিয়া গুরুই ভগবান এই বুদ্ধি লইয়া যদি কুলগুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন তবে সেই আত্মসমর্পণকারী সাধকের দ্বারা তাঁহার নিজেরই নহে সেই কুলগুরুরও কল্যাণ হইবে। এমনও দেখা গিয়াছে এইরূপ কুলগুরু ও তাঁহার শিষ্য শেষে উভয়ে একই সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। ভগবৎ লাভের প্রেরণা যেখানে বড় সেখানে কোনও সংস্কারই টিকে না। গুরুকরণ সম্বন্ধে প্রত্যেক শিষ্যের বিশেষ যাচিয়া পরীক্ষা করিয়া গুরু করা উচিৎ। গুরু করিবার পর আর পরীক্ষা করা চলে না,

তখন পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। যে শিষ্য গুরুচরণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারিল সদ্‌গুরুর কৃপা তাহার উপর সেই আধার দিয়াই অবতীর্ণ হইবে। মোটকথা গুরুতে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভরতা চাই। যাচাই আগে করা চলে- গুরুকরণের পর নহে। কুলগুরুর কাছে দীক্ষা লওয়ার পরও সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লওয়া যায়। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষালাভের পর আর কোন দীক্ষার প্রয়োজন হয় না। কুলগুরুদের চিন্তা করা উচিত যে, যাহার ভার তিনি গ্রহণ করিবেন তাহার মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারও মুক্তি নাই। শিষ্য নরকে গেলে গুরুকেও নরকে যাইতে হইবে।

গুরুশক্তি প্রকাশের তারতম্য

গুরুশক্তি সকলের মধ্যে রহিয়াছে। গুরু তাঁহার শক্তিপূত নাম প্রত্যেক শিষ্যকেই দিয়াছেন। তিনি সকলের মধ্যে সমভাবেই রহিয়াছেন। যে আধার যত স্বচ্ছ তাহাতে তত সেই শক্তির প্রকাশ হয়। কাজেই আধারই প্রকাশের তারতম্যের কারণ। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারের বশে আধারের তারতম্য হয়। এই সংস্কার যত কাটিয়া যাইবে, ময়লা যত দূর হইবে- তত তাঁহার প্রকাশ উপলব্ধি হইবে। যখন সব আধারগুলি পূর্ণ স্বচ্ছ হইবে তখন সবেতেই প্রকাশ একরূপ পরিলক্ষিত হইবে। মনে কর দশজনে দশটি আরশি বাজার হইতে যখন নূতন কিনিয়া আনিল- সবগুলিই পরিষ্কার, স্বচ্ছ, সবেতেই একইরূপ মুখ দেখা যায়। যে নিয়মিত পরিষ্কার করিয়া রাখিল তাহার আরশিতে প্রত্যহ একইভাবে মুখ দেখা গেল। আর যে আলস্য করিয়া সাফ করিল না, দেখা গেল একদিন তাহার মুখই দেখা যায় না। যে যেমন কর্ম করিবে, তাহার অনুপাতে তাহার আধার স্বচ্ছ থাকিবে বা আবিল হইবে। সূর্য্যরশ্মি সর্বত্র সমভাবে প্রকাশ দিতেছেন, স্থানভেদে আলোর প্রবেশ অনুসারে স্থান আলোকিত বা অন্ধকার থাকিতেছে। জীবন যত স্বচ্ছ হইবে, তত তাঁহার প্রকাশ উপলব্ধি করিবে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার ও আহার

পৃথিবীতে নানান্ ধর্মমত আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি অনুসারে তাহাদের বিধি নিষেধ ও আহার আচারাদির নির্দেশ রহিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এই বিধি-নিষেধ এবং আহার ও আচারের ব্যবস্থা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাধন পথে যাত্রার অনুকূল ভাবেই নির্দিষ্ট হইয়াছে ও তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা।

এই সাধন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক

এই সাধন সকল ধর্মের, সকল জাতির, সকল বর্ণের ও সকল সম্প্রদায়ের লোকেই গ্রহণ করিতে পারে। আপন আপন রীতিনীতি বজায় রাখিয়া “অজপা-সাধন” দ্বারা প্রত্যেক জাতি, ধর্ম, বর্ণের লোকেই শ্রেয় লাভ করিতে পারেন। অজপা সাধন একটি ধর্মমত নহে, একটি বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতি। অপ্রাকৃত শক্তিযুক্ত নাম শ্বাসে

শ্বাসে জপই এই সাধনের বিশেষত্ব। এই সাধনের সহিত মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, নানকপন্থী প্রভৃতি ধর্ম্মের সাধনের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ বহু সম্প্রদায়ের সাধকেরাই করেন। ভগবান বিজয়কৃষ্ণ সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের সাধকদের সম্মান করিতে ও ধর্মস্থানে- দেবমন্দিরে, মস্‌জিদে, গির্জ্জায়, সর্বত্র সেই ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ভাবনা করিয়া সর্বত্রই তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া প্রণতঃ হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। ভগবান এক - অদ্বৈত, তিনিই বহুরূপে সর্বত্র প্রকাশিত আবার সর্ব্বরূপই তাঁহার একরূপে বিলয়প্রাপ্ত। সর্ব্ব সম্প্রদায়ই তাঁহার সম্প্রদায়, সব সম্প্রদায়েই উপাস্য এক ভগবান। দলাদলি ধর্ম নহে, সাম্প্রদায়িকতা ধর্ম নহে, ভেদাভেদ ধর্ম নহে। শ্রীভগবানের উপাসনাই ধর্ম। সর্বত্র তাঁহাকে দর্শনই সাধনা।